মায়া মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্র

(চিঠি : ১)

ঘাটশিলা

৫ই জ্যৈষ্ঠ। বুধবার।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার পত্র বহুদিন পেয়েও নানা কারণে উত্তর দিতে পারিনি। তোমার মামীমা ও তোমার ছোটভাই বাবলু এখানেই। বাবলু বড় দুষ্টু হয়েচে। তবে বেশ বুদ্ধিমান এ বয়সেই। উমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে গত ১৬ই বৈশাখ। সে ভিজাখাপটম গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি।

তুমি মুক্ত প্রকৃতির উপাসিকা, কলকাতার বদ্ধ ঘরে বসে বেগুন-পটল কুটে আনন্দ পাবার মন তোমার নয়। প্রকৃতির যে সীমাহীন রূপ মনে অমৃতত্বের সন্ধান এনে দেয়, কলকাতার কোনো গলির মধ্যেই সে রূপ নেই। আমি কালই কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। গত ৮/৯ দিন কলকাতা, বর্ধমান, কাটোয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করতে হয়েচে। কলকাতাতে এবার কয়েকদিন কেটেচে এই গরমে। সে যে কি বন্ধনের পীড়ন, মন সর্বদা আকুল হোত কবে নিজের দেশ বারাকপুরে কিংবা ঘাটশিলায় গিয়ে বনের ফুল দেখবো ফুটতে, নদীজলে স্নান করবো ইছামতীতে কিংবা ঘাটশিলায় কচিপাতা-ওঠা শালবনে নির্জনে একা বসে থাকবো শিলাসনে সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্না পড়বে কুরচি ফুলের গুচ্ছে, ঝিঁ ঝি ডাকবে বনে বনান্তরে, দিগন্তে দেখবো নীল নীল পাহাড়ের রেখা, সন্ধ্যার ঈষওপ্ত বাতাসে ভুরভুর করবে ফুটন্ত কুরচি ফুলের সুবাস।

কাল এখানে এসেই তাই বিকেলে ফুলডুংরির পেছনের বনে একটা নিভৃত আমার প্রিয় স্থানটিতে গিয়ে একা বসেছিলাম। যেখানে বসেছিলাম তার সামনে একটি পাথরের খাদ। ধারে ধারে কুরচি ফুলের অজস্র প্রাচুর্য, পাখি ডাকচে বনে, সন্ধ্যার শোভা—মন ধীরে ধীরে ভগবানের শিল্পীসত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

"পশ্য দেবস্য কাব্যং

ন সমার ন জীর্য্যতি"

উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'সকলে দেবতার এই কাব্য দর্শন করো, এ কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, কখনো জীর্ণ হয় না।' বিশ্ব ভগবানের লেখা মহাকাব্য। সবাই পড়তে পারে না এর লেখা। যে পারে, সে অমরত্ব লাভ করে।

তুমি জয়পুর গিয়ে সেই মুক্ত প্রকৃতির আস্বাদ পেয়েচ জেনে খুশি হয়েছি। আবার যদি ঘাটশিলাতে আসো৺পূজার সময়, ধারাগিরির অরণ্যে যাওয়া যাবে। মনে আছে সেই জ্যোৎস্নালোকিত শাল-অরণ্যের কথা? সেই ক্ষুদ্র কলস্বনা ঝরনার কথা?

তোমার মামীমাকে চিঠি দিয়ো।

আমার আশীর্বাদ ও স্নেহসম্ভাষণ নিয়ো। আশা করি দীপু এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠেচে। তাকে আশীর্বাদ দিয়ো।

ইতি

তোমার মামাবাবু

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—কলকাতায় ফিরবে যখন জানিও, দেখা করবো।

(চিঠি : ২)

ঘাটশিলা

বুধবার

স্নেহাস্পদাসু,

শুনলাম তোমরা জয়পুর থেকে এসেচ। কলকাতার জীবন আজকাল বড় কোলাহলমুখর ও জনতাবহুল। ভালো লাগে না এক দণ্ড। আমি কাল দেশ থেকে এখানে এসেছি ১৬/১৭ দিন পরে। তোমার মামীমা ও খোকা এখানেই বরাবর আছে। আমি যশোহরে মাইকেল মধুসূদনের জন্মোৎসব সভায় যোগ দিতে গিয়ে দেশে যাই ও একাই এই ১৬ দিন ছিলাম। বর্ষার মেঘমেদুর অপরাহ্নে স্বচ্ছধারা ইছামতীর কালো জলে নাইতে নামতাম। জলে হলুদ রংয়ের বাবলা ফুল টুপটাপ করে ঝরে পড়তো সজল বাতাসে। পানকলস শেওলার কুচো কুচো সাদা ফুল ফুটে থাকতো জলের কিনারায়। যজ্ঞিডুমুর গাছ থেকে গুলকলতা ঝুলে পড়ে জলের ওপর দুলতো। গাঙশালিখ আর দোয়েল কলরব করতো যজ্ঞিডুমুর ও বাবলাগাছের ডালে ডালে। ওপার থেকে ঘন কালো মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে উড়ে এসে জল স্থল মাঠ, ঘাট অন্ধকার করে থমকে থাকতো মাথার ওপর। সে যে কি এক অপূর্ব অনুভূতি! প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মন যে খোরাক পায়, তাই তাকে জীবনের সত্যপথ চিনিয়ে দেয়। কারণ প্রকৃতির সৌন্দর্যশিল্প সেই ভগবান ছাড়া আর কারো নয় জেনো। একটি শ্যামচ্ছদ বৃক্ষতল অনেক মার্বেল পাথর বাঁধানো মন্দিরের চেয়ে ভগবানের উপাসনা করবার উপযুক্ত স্থান।

আমি দিন কয়েক এখানে থাকবো, আট-দশ দিন। তারপর একবার হাজারিবাগ যাবো। খোকা পাশ করেচে শুনে আনন্দিত হয়েছি। তাকে আমার আশীর্বাদ দিয়ো। তুমিও স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো।

আঃ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(চিঠি : ৩)

ঘাটশিলা
শুক্রবার

কল্যাণীয়াসু,

আমি এখানে ছিলাম না। গত পরশু এসেছি। এসে শুনলাম তোমরা জয়পুর থেকে এসেছ। আশা করি বাড়িতে এখন সবাই ভালো আছে।

আমি মোটরে হাজারিবাগ থেকে গয়া জেলার অন্তর্গত একটি P.W.D. inspection বাংলোতে ও তারপর বহির্বাংলোতে ও বগোদর বাংলোতে দিন পনেরো কাটিয়ে এলাম। আমার এক বন্ধু ফরেস্ট অফিসার, তারই মোটর। এত চমৎকার বন ও পাহাড়ের দেশ ওই সব! সাদা পাথরের ওপর দিয়ে বরসুতি ও বরাকর নদী বয়ে যাচ্ছে। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপারেই শালবন ও মহাভাল (২১০০ ফুট) শৈলমালা। নির্জন অরণ্যে ধনেশ পাখি ডাকচে; রাত্রে বারকাট্টা বাংলোয় শুয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের অপরপার্শ্বস্থ বনে বাঘের ডাক শুনেছি। বেশি রাত্রে বনশীর্ষে জ্যোৎস্নারাত নিস্তব্ধ রজনীর গম্ভীর শোভা দেখেছি। বনে বনে বড় বড় পাথর বিছানো আসন, তার চারিধারে Lantana ফুল ফুটে আছে। সূর্যাস্তের সময় ৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপর শৈলাসনে বসে থেকেছি আপনমনে। ধারাগিরির ঝরনা ও সরোবরের মতো কত ঝরনা ও পাথর বাঁধানো সরোবর দেখেছি গভীর বনের মধ্যে, স্নানও করেছি সে জলে।

একস্থানে বনের মধ্যে একটা উষ্ণ জলের উৎস আছে। জল এত গরম যে আমরা গামছায় বেঁধে চাল, আলু, ডিম বেঁধে ছেড়ে দিলাম জলের মধ্যে একটা লম্বা লাঠির সাহায্যে, আর ঠিক ২৫ মিনিটের মধে ভাত, আলুভাতে ও

ডিমভাতে হয়ে গেল। ঈষৎ গন্ধকের গন্ধ জলে কিন্তু খাদ্যে সে গন্ধ আসে না। জল ভীষণ গরম, সর্বদা বাষ্প উঠচে, কাছে যাওয়া যায় না—১০০°ওপর তাপ। বনের মধ্যে সে এক বেশ দৃশ্য! আমরা Picnic করেছিলাম সেখানে গত রবিবারে।

আমি ভালো আছি। তোমার মামীমা ও খোকা ভালো আছে। আমার আশীর্বাদ নিয়ো ও বালকবালিকাদের দিয়ো।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(চিঠি : ৪)

(ডাকঘরের ছাপ;

১৫ জানুয়ারি, ১৯৪৯)

ঘাটশিলা

শুক্রবার

কল্যাণীয়াসু,

মায়া, তোমার সংবাদ বহুদিন পরে পেয়ে সুখী হয়েছি। আমি গত ১০/১২ দিন কলকাতায় ছিলাম—দিন ৩/৪ হল এসেছি। এসেই অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রির শোভায় বিশ্বদেবের প্রত্যক্ষ আর্বিভাব যেন নিত্যনতুন হয়ে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, মুক্ত প্রান্তরের দূরাস্তৃত মহিমায় চোখের সামনে নিত্যদিনের আশীর্বাদরূপে দেখা দিলো। তুমি থাকলে এ দেখে আনন্দ পেতে। তোমার নাম আমার 'বনে ও মনে' বলে বইখানাতে ধারাগিরি ভ্রমণের মধ্যে থাকবে। 'দেশ' পত্রিকায় শীঘ্র ওই বইখানা বেরুবে। সময় পেলেই তোমাদের বাড়ি যাবো। এখানকার সবাই ভালো আছে। বাবলুর শরীর মন্দ না। বড় দুষ্টু হয়েচে। তবে বেশ বুদ্ধিমান। এর মধ্যে চাঁদের শোভা দেখতে শিখেচে। হাঁ করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর বলে 'আই আই-টি-ই'। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে কপালে টি দেয়।

আজ ওবেলা পূর্ণিমার রাত্রিতে চ্যাংজুড়ির বনে জ্যোৎস্নালোকে ভ্রমণ করতে যাবো। এখন থেকে তোড়জোড় হচ্চে।

আশীর্বাদ নিয়ো

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা চ্যাংজোড়ার বনে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় দেখতে যাবো। ৩ মাইল এখান থেকে। কাশিডা থেকে ১ মাইল দূরে। একটা চমৎকার পাহাড়ি জায়গা আছে। হাতির মতো বড় বড় পাথর পড়ে আছে। ওই বনে সেদিন একা বসেছিলাম সন্ধের পর, দেখি একটা হুড়াল (নেকড়ে বাঘ) ৫০ গজ দূর দিয়ে চলে যাচ্চে। আজ আমরা ৭/৮ জন সেখানে গিয়ে tea picnic করা হবে। তুমি থাকলে খুশি হোতে। তোমার 'আলেয়া' গল্পটি কি বার হয়েচে? কলকাতায় গেলে দেখিও। তোমার মামীমার গল্প এ মাসের 'কল্যাণশ্রী'-তে বার হয়েচে।

তোমারা যে বাসায় ছিলে, এখন প্রমথ বিশী সপরিবারে সেখানে আছে। প্রায়ই সন্দেবেলা ওখানে গিয়ে বসি।

পত্র-পরিচিতি

চিঠি: ১

‘তোমার মামীমা...’:বিভূতিভূষণ সহধর্মিণী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘বাবলু..’ বিভূতিভূষণের একমাত্র পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘উমার বিয়ে...' ভাগ্নী উমা। বিভূতিভূষণের ভগ্নী জাহ্নবী দেবীর কন্যা। ১৯৪৮-এর মে মাসে উমার বিয়ে হয় সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

চিঠি: ২

‘যশোহরে মাইকেল মধুসূদনের জন্মোৎসব সভায়...’ :এই সভায় বিভূতিভূষণের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসু।

চিঠি :৩

‘আমার এক বন্ধু ফরেস্ট অফিসার..’ :যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা।‘ পথের পাঁচালীকে বিভূতিবাবুর’ রচয়িতা।

‘রাত্রে বারকাট্টা বাংলোয় শুয়ে...’ :১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে বিভূতিভূষণ হাজারিবাগে রামগড় যান। সেখান থেকে যান রাজরাপ্পায়। পরে গয়া হয়ে বারকাট্টা অরণ্য অঞ্চলের ফরেস্ট অফিসে সতেরো দিন থাকেন।

চিঠি : ৪

‘বনে ও মনে’ বইখানাতে..’ :বইটি আর বিভূতিভূষণ লিখে যেতে পারেননি। তাই দেশ পত্রিকায় প্রকাশেরও কোনো প্রশ্ন নেই।

‘মামীমার গল্প ও মাসের ‘কল্যাণশ্রী’-তে...’ :রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প এক সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

‘প্রমথ বিশী সপরিবারে..’ :সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ প্রমথনাথ বিশী।